দ্বিতীয় অধ্যায়

কল্লোল চেতনা ও বাংলা উপন্যাসে নূতন ধারা

দ্বিতীয় অধ্যায়

কল্লোল চেতনা ও বাংলা উপন্যাসে নূতন ধারা

"যেদিন আমায় খুঁজবে-
বুঝবে সে দিন বুঝবে।
স্বপন ভেঙ্গে নিসুত্ রাতে জাগবে হঠাৎ চমকে,
কাহার যেন চেনা ছোঁয়ায় উঠবে ও বুক ছমকে, -
জাগবে হঠাৎ চমকে।"।

- ১

এই চমকে ও জেগে ওঠার প্রেরণা জেগেছিল রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে তরুণ কথাশিল্পীদের মনে। এঁরা সকলেই সেকালের কথাসাহিত্যের বিশিষ্ট শিল্পীর মর্যদা না পেলেও কথাসাহিত্যের ধারায় তাঁরা নূতনত্বের সঞ্চার করেছিলেন। তাঁদের এই নূতন ধারা, প্রচলিত কথাসাহিত্যের ধারা থেকে অন্যদিকে বাঁক নিয়েছিল। তাঁরা এই বাঁকে নূতন বিষয়ভাবনা ও জীবনের ব্যাখ্যা উপন্যাসে তুলে ধরলেন। তাঁদের লিখনের ভঙ্গি ও আঙ্গিকের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। কথাসাহিত্যের এই নূতন ধারায় তাঁরা যেমন বিভিন্ন বিষয় উপলব্ধি করলেন তেমনি উপন্যাসের আঙ্গিকে নূতনত্বও আনলেন। তাঁরা প্রচলিত চিন্তা-চেতনার বিরুদ্ধাচারী ছিলেন এবং সেইভাবে তাঁদের উপন্যাসগুলি অভিনবত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। মানব জীবনের বিভিন্ন স্তর থেকে এই চেতনা এসেছিল। নর-নারীর দেহচেতনার সঙ্গে রোমান্টিক প্রেমচেতনা মিশিয়ে মানুষের জটিল সম্পর্কের এক নূতন তাৎপর্য তাঁরা উপন্যাসে তুলে ধরলেন। এই জটিল সম্পর্কের কেন্দ্রে ছিল নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষেরা। তারা বেশির ভাগই ছিল নাগরিকমনস্ক। তারা ছিল উচ্চশিক্ষিত ও বিবেকবান মানুষ। বিশেষ করে মধ্যবিত্তদের জীবনে প্রেমের অন্তঃসারশূন্য রূপটি সেকালের উপন্যাসের নর-নারীদের জীবনে দেখা গেল। শুধু তাই নয়, উপন্যাসগুলি নর-নারীর কামনা বাসনার ক্ষেত্রে অন্যমাত্রা পেয়েছিল। তা কখনো

হতাশার, আবার কখনো ছিল বেদনার। এই আনন্দ-বেদনার রূপকথা সেকালের কথাসাহিত্যিকদের ভাবনা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। আবার কথাসাহিত্যের সুস্পষ্ট আদর্শ থেকেও সেকালের তরুণ লেখকেরা সরে এলেন। তাঁরা সমাজ জীবনের জটিল রূপ বিন্যাসে মন দিলেন। তাঁরা দুরন্ত আবেগে মানুষের জীবনে যৌনতার প্রশ্নকে প্রবলভাবে স্বীকৃতি দিলেন। তাঁরা প্রচলিত ছকের চরিত্রগুলিকে এই চেতনায় জীবন্ত করে তুলেছিলেন। শুধু তাই নয়, এই তরুণ লেখকরা গল্প উপন্যাসের চরিত্রগুলির পুরোনো মূল্যবোধ ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। এই মনোভাব শুধু কথাসাহিত্যেই ছিল না, সাহিত্যের অন্য শাখাতেও পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাতেই পুরোনো ভাবনা অতিক্রম করার উদ্দাম মানসিকতা লক্ষ করা যায়। তাঁদের লেখায় যেন একটা বিদ্রোহ দেখা দিল। এই বিদ্রোহের অন্যতম লক্ষ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনা থেকে ভিন্ন ধর্মী বা নূতন সাহিত্য ধারার প্রেরণা সেদিনের বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় দেখা দিল। পরবর্তীকালে এই পত্রিকা থেকেই নূতন সাহিত্যের পথ পরিক্রমা শুরু হয়েছিল। নূতন শিল্পাদর্শের আলোয় সনাতন মূল্যবোধগুলি তরুণ কথাশিল্পীদের লেখার ঝাঁঝে কেঁপে উঠেছিল। এই কম্পনে রবীন্দ্র সাহিত্যের বিরুদ্ধে একটি নূতন বিদ্রোহের ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন -

"যাকে কল্লোল যুগ বলা হয় তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সেই বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই বরীন্দ্রনাথ।" - ২

রবীন্দ্রনাথের সময় ও উত্তরকালের কিছু কথাসাহিত্যে বিধবার প্রেম ও আবার বিবাহ, অসবর্ণের প্রেম ও বিবাহ, পণপ্রথা ও কৌলীন্য প্রথা, জমিদারের অত্যাচার ও ব্যভিচার, বারবণিতার জীবন কথা, দাম্পত্য জীবনের সম্পর্ক প্রভৃতি ধারণাগুলি তরুণ লেখকদের সাহিত্যে আমূল সংস্কার ঘটিয়েছিল। এই সংস্কারের প্রয়োজন ছিল বলেও আমরা মনে করি। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের এই সংস্কার ও নূতন ধারার প্রসারে বাংলা সাময়িকপত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বাংলা সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আর এই পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে নূতনত্বের আভাস লক্ষ করা যায়। এর পরে বিভিন্ন বাংলা সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সব পত্রিকার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। আবার এই নূতনত্বে বেশ কিছু লেখকও আত্ম প্রকাশ করলেও নূতন কোন সাহিত্যযুগের বাঁক দেখা

যায় না। এই ধারা থেকে তরুণ লেখকরা তাঁদের লেখায় বাংলা কথাসাহিত্যে নবচেতনার সৃষ্টি করেছিল। এই পরিবর্তনের আবহাওয়ায় ও পেক্ষাপটে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম নিয়েছিল 'কল্লোল'।

কল্লোলের আগে বাংলার সাময়িক পত্রিকা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিতে অসাধারণ ভূমিকা নিয়েছিল। অবশ্য যে কোন সাময়িকপত্রের মধ্যে দিয়ে দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের চেতনা ধরা পড়ে। তবে বাংলা সাহিত্যের নূতন ধারা আনার ক্ষেত্রে কল্লোলের ভূমিকা বাংলা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই পত্রিকাটির উদ্ভবের বীজ নিহিত ছিল "ফোর আর্টস ক্লাবের" মধ্যে। এখানে বিভিন্ন খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের আসর বসেছিল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে গোকুলচন্দ্র নাগ ও তাঁর বন্ধুদের সক্রিয় সহযোগিতায় এই ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সুনীতি দেবী, দীনেশরঞ্জন দাস ও মণীন্দ্রলাল বসু। এই চারজনে একটি করে গল্প লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে এই চারটি গল্প "ঝড়ের দোলা" নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়। তাঁরা এই বইয়ের রচনাগুলি প্রকাশের মধ্য দিয়েই একটা পত্রিকা প্রকাশের প্রেরণা পেয়েছিলেন। অবশ্য এর আগে থেকেই তাঁরা একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। কিন্তু তার আগেই "ফোর আর্টস ক্লাব" এর অবলুপ্তি ঘটে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাবটির অস্তিত্ব বিপন্ন হলেও এর মধ্যে দিয়েই কিছু তরুণ কবি সাহিত্যিকের মনে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা থেকেই গেল। তাঁরা এই আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণরূপ দিতে "কল্লোল" মাসিক পত্রিকার সংকল্প নিয়েছিলেন। তাঁদের এই সংকল্পের মধ্যে দিয়েই পত্রিকাটির জন্ম হওয়ার ইতিকথা বলা যেতে পারে। এছাড়া সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের "বাসন্তিকা" পত্রিকার তরুণ লেখকদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা কল্লোল পত্রিকা প্রকাশে সাহায্য করেছিল। আসলে তৎকালীন সমাজ সংস্কৃতির একটা পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের তাগিদেই ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে "কল্লোল" পত্রিকার প্রকাশ ঘটেছিল। দীনেশরঞ্জন দাস এই পত্রিকা প্রকাশনার ও সম্পাদনার ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি "বাসন্তিকা" পত্রিকার লেখকদের লেখা নিয়ে "কল্লোল" প্রকাশের সংকল্পকে বাস্তবে রূপ দিলেন। সহযোগী হিসাবে ছিলেন গোকুলচন্দ্র নাগ। এবিষয়ে সুকুমার সেন বলেছেন -

"কল্লোলের বীজ বোনা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে, ছাত্রদের বার্ষিক পত্রিকা বাসন্তিকায় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে"। - ৩

পত্রিকাটির নিজস্ব প্রেস না থাকায় প্রথম দিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রেসের নাম ও ঠিকানায় "কল্লোল" পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। দীনেশরঞ্জন দাস এই পত্রিকার আদর্শ সম্পর্কে বলেছেন বাংলা সাহিত্যে একটা নূতন বাঁকের সন্ধান এই পত্রিকাটিতে পেয়েছিলাম। বাংলার পাঠককুলকে নবচেতনার সন্ধান দিয়েছিল এই "কল্লোল"। বাঙ্গালী পাঠককে বহুকাল মোহাচ্ছন্ন করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এপ্রসঙ্গে "সংহতি" (১৯২৩ খ্রীঃ) নামে আরেকটি পত্রিকার উল্লেখ করা যায়, যার জন্ম হয়েছিল "কল্লোল" এর জন্মের একই বছরে ও একই মাসে। কিন্তু পত্রিকাটি দুই বছরের মধ্যেই উঠে যায়। "কল্লোল" এর সঙ্গে এই পত্রিকার আদর্শগত পার্থক্য ছিল। "সংহতি"তে একদিকে ভাঙ্গন, অন্যদিকে সংগঠনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্ঠা দেখা যায়। কিন্তু "কল্লোল", সমাজের পচা গলা ভিত্তিকে উৎখাত করতে চেয়েছিল। প্রচলিত বাঁধা বন্ধনের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ "কল্লোলে" আলাদা তাৎপর্য এনেছিল। "কল্লোলে"র অন্যতম প্রধান লক্ষ ও আদর্শ ছিল যুগ ধর্মকে প্রকাশ করা। তাই মানুষের জীবনের বিভিন্ন আস্থিরতা, চিন্তা-ভাবনা ও সমস্যাকে কল্লোলে ফুটে উঠতে দেখি। বস্তুতঃ "কল্লোল" এর সময় প্রবল বিরুদ্ধবাদ ও বিহ্বল ভাববিলাস লক্ষ করা যায়। সুতরাং কল্লোল থেকে একটা সামগ্রিক মূল্যবোধের পরিবর্তনের সূচনা দেখতে পাই। এই পরিবর্তন শুধু সাহিত্যেই ছিল না, সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ধরা পড়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সংশয় পীড়িত মানুষের জীবন স্পষ্টভাবে জানতে গেলে তাই "কল্লোল" এর কথা অবশ্যই এসে পড়ে। কারণ "কল্লোল" এর প্রেক্ষাপটই ছিল সেদিনের সাহিত্যের নূতনত্বের আভাস। এই পটভূমিতে কল্লোল পত্রিকায় যে নূতন ধারা এসেছিল সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

উপন্যাস হল এক ধরনের দর্পণ। দর্পণে যেমন বিভিন্ন ছবি প্রতিফলিত হয় তেমনি উপন্যাসে আমাদের পরিবর্তনশীল সমাজের বিভিন্ন মানুষের স্বভাব বৈশিষ্ট্য ও আচার আচরণের ছবি প্রতিফলিত হতে দেখি। এই প্রতিফলনে যুগ অনুযায়ী আলাদা বৈশিষ্ট্য আমাদের সামনে ভেসে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী উপন্যাস সাহিত্যে এই বৈশিষ্ট্য উপন্যাসে একটা যুগকে সূচিত করেছিল। এই যুগকে অনেকে আধুনিক বলে মনে করেন। কিন্তু যখন বলি আধুনিক, নূতন, তখন বুঝি এক বিশেষ ধরনের উপন্যাস যার মধ্যে বিশেষ স্বভাব বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে। যা দীর্ঘদিনের বিবর্তনের ফলে একটা নূতন রূপ গ্রহণ

করেছে। যার মধ্যে প্রথম দিকের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে গভীরভাবে পার্থক্য দেখা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি যখন নূতন পথকে নির্দেশ করে তখনই উপন্যাসের স্বতন্ত্র ধারা প্রবাহিত হয়। এই নূতন ধারা বলতে এক গুচ্ছ লেখকের সাহিত্যের নূতন আঙ্গিকের ও চেতনার সমষ্টিগত আদর্শকে বুঝি। অর্থাৎ দীর্ঘ দিনের উপন্যাসের ধারাবাহিক উত্তরাধিকার হতে এই নূতন ধারার উপন্যাসের জন্ম। তা দীর্ঘদিনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের ফল। এই বৈশিষ্ট্যগুলি একদিকে যেমন উপন্যাস জগতে যুগান্তর এনেছিল অন্যদিকে তেমনি নব্য যুগের সূচনা করে। চলমান সাহিত্যধারা থেকে ঔপন্যাসিকদের বাঁক ধরে হাঁটতে গিয়ে ঐ নূতন ধারায় মানুষের যে মূল্যবোধ, চিন্তা চেতনা এসে মিলিত হয় সেই ধারাই হল সাহিত্যে নূতন ধারা। সত্যেন্দ্রনাথ রায় বলেছেন-

"নতুন মূল্যবোধ আকাশ থেকে পড়ে না, নতুন স্বভাব শূন্য থেকে আপনে গজায় না, অভিনব সাম্প্রতিক যাদুকরের আম গাছ নয়। সেও ইতিহাসের সন্তান। তার জন্য ভিতরে ভিতরে অনেক প্রস্তুতি চলে। জানি না - জানি, তার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়ে। তা অনেক প্রচ্ছন্ন এবং প্রকাশ্য তোলপাড়ের বৈপ্লবিক পরিণাম। ছোট হোক, বড় হোক, প্রত্যেক আধুনিকতা যেমন একটি যুগান্তরের পালা, অন্যদিকে তেমনি একটি নব যুগেরও পালা। সবকিছুকে তা ভাঙ্গে না। নদী এইখানে এসে থেমে যায় না, তা একটি বড় বাঁকের সূচনা করে। অথবা বলতে পারি তাকে অবলম্বন করে একটি পালাবদল ঘটে যায়।" - ৪

এই নূতন ভাবনার পরিচয় সেকালের সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক পেক্ষাপটে নিহিত ছিল। একদিকে সমাজের মধ্যে সুপ্ত থাকা চাপা সংগ্রামের ছবি অন্যদিকে নরনারীর ভালোবাসা, যৌনতার স্থূল ভোগ-বাসনা, আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতার সুর "কল্লোল" গোষ্ঠীর সাহিত্যে ফুটে ওঠে। একই সঙ্গে এই পত্রিকায় জীবনের যন্ত্রণা ও বিফলতার অবসাদ দেখা যায়। যাকে অনেক সমালোচক যুগের যন্ত্রণা বলেছেন। এই যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানব জীবন প্রসঙ্গ "কল্লোলে" উঠে আসতে দেখা যায়। শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত শ্রমিক শ্রেণী, বস্তিবাসী ও বেশ্যালয়ের জীবন, শহরের অর্থনীতি ও তাদের সামাজিক অবস্থান ও পরিবর্তন "কল্লোলে" দেখানো হয়েছে। বিধবার জীবনে ব্যথা-বেদনা, প্রেম ও বিবাহের স্বীকৃতি পেতে কল্লোলে দেখি। পণপ্রথার অভিশাপ "কল্লোল" এর লেখকরা না দেখিয়ে দাম্পত্য জীবন ও পারিবারিক সম্পর্কের জীবন যন্ত্রণা উপন্যাসগুলিতে তুলে ধরেন। যৌন জীবন,

প্রেম ও তার নানা সমস্যা "কল্লোল" গোষ্ঠীর গল্প উপন্যাসগুলিতে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে ওঠে। যৌন মনস্তাত্ত্বিক জীবনের ব্যাখ্যা ও তার প্রতিফলন "কল্লোল"এর সময়ের উপন্যাসগুলিতে দেখতে পাই। "কল্লোল" পূর্ববর্তী কথাসাহিত্যে অধিকাংশই ইতিহাসের কাহিনী স্থান পেয়েছিল। কিন্তু ইতিহাসের মূল্য "কল্লোল" এর লেখকরা না দেখিয়ে সেখানে নর-নারীর প্রেম ভালোবাসার রোমান্টিক গল্পের শৈল্পিক মূল্য ধরা পড়েছে। নর-নারীর জৈবিক সমস্যা উপন্যাসে গভীরভাবে ফুটে উঠতে দেখি, যেটা "কল্লোল"এর পূর্ববর্তীকালের লেখকদের রচনায় তেমনভাবে পাওয়া যায় না। তবে সমাজ বিশ্লেষণে তাঁদের আগ্রহী হতে দেখা যায় না। এই সময়ের উপন্যাসে ধনী, দরিদ্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য অঙ্কিত করা হলেও লেখকের সামাজিক পরিচয়ের চেয়ে তার রোমান্টিক মনোভাবের পরিচয় অধিকতর বেশি বলে মনে হয়।

পূর্বকালের সাহিত্যধারার সঙ্গে "কল্লোল" এ প্রকাশিত সাহিত্যধারার মৌলিক পার্থক্য হল, অভিনবত্ব ও যুগচিন্তার বিষয়ে। এই চিন্তাকে প্রতিফলিত করতে গিয়েই "কল্লোল"এর আসরে যে লেখকবৃন্দ ছিলেন তাঁরা "কল্লোলগোষ্ঠী" নামে অভিহিত হন। তাঁরা বাংলা সাহিত্যে একটা নবযুগের জন্ম দিতে চেয়েছিলেন। এই নবযুগকে "কল্লোলপর্ব" বলেও অনেকে মনে করেন। এই গোষ্ঠীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছিলেন -

"বস্তুত "কল্লোল" যুগে এ দুটোই প্রধান সুর ছিল, এক, প্রবল বিরুদ্ধবাদ; দুই, বিহ্বল ভাব বিলাস। একদিকে অনিয়মাধীন উদ্দমতা, অন্যদিকে সর্বব্যাপী নিরর্থকতার কাব্য। একদিকে সংগ্রামের মহিমা, অন্যদিকে ব্যর্থতার মাধুরী। আদর্শবাদী যুবক প্রতিকূল জীবনের প্রতিঘাতে নিবারিত হচ্ছে- এই যন্ত্রণাটা সেই যুগের যন্ত্রণা।" - ৫

কল্লোলযুগের এই বিরুদ্ধবাদের সূচনা হয়েছিল রবী-দ্রনাথকে নিয়ে। রবী-দ্রনাথের কথাসাহিত্যের মূল আদর্শকে মানদন্ড করে "কল্লোলগোষ্ঠীর" লেখকরা যে নূতন ধারা আনলেন তা তুলে ধরা প্রয়োজন। এরই সঙ্গে আলোচনায় উঠে আসে সেকালের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি, যা সেকালের "কল্লোল"এর বাতাবরণ তৈরী হতে সাহায্য করেছিল।

ত্রিশ দশকের বিভিন্ন বিপ্লবী কার্যকলাপ ও আন্দোলন বাংলার পরিবেশকে দিশাহীন করে তুলেছিল। এই সময় উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত তরুণ লেখকেরা ইংরেজ বিরোধী লেখা থেকে বিরত থাকলেন। তাঁরা বরং ইংরেজী কালচারে আরো বেশি অভ্যস্ত হয়ে রবীন্দ্র-বিরোধী সাহিত্যের দিকে ঢলে পড়লেন। তাঁরা সেকালের রাজনৈতিক কার্যকলাপকে খানিকটা উপেক্ষা করে গিয়েছিলেন বলা যেতে পারে। প্রবীণ সাহিত্যিকরা অনেকেই তরুণদের এই পথকে অবহেলা ও অস্বীকার করেছিলেন। এইভাবে সাহিত্যের জগতেও ছিল এমন একটা বিরোধিতার আবহাওয়া, যা মোটেই সুখের ছিল না বলে মনে করা হয়। সাম্যবাদী রাজনীতি তখন ভালোভাবে পরিপুষ্ঠতা লাভ করে নি। সব পথ যেন গতানুগতিক সাহিত্য লেখায় মশগুল হয়ে পড়েছিল। এই প্রেক্ষাপটই ছিল সেদিনের অতিআধুনিক সাহিত্য আন্দোলনের প্রেরণা। এই সব তরুণদের সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের অনেক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। অতিআধুনিক সাহিত্যে তরুণরা প্রবলভাবে আকর্ষিত হতে লাগলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৯ খ্রীঃ) রাজনৈতিক আবহাওয়ায় পশ্চিমী সাহিত্য বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করল। বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে এই ভাবনাগুলি আছড়ে পড়ল। আরো বলতে পারি ঐ ঢেউ তরুণদের বুকে এক নূতন প্লাবন এনেছিল। এই হল সেদিনের আধুনিক সাহিত্য আন্দোলনের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। মানুষের জীবনে প্রেম, দাম্পত্য সম্পর্ক, পাপ-পুণ্যের পুরোনো বিশ্বাস ও ধারণাগুলি বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে একটা ভয়ঙ্কর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হয়েছিল। বিশের দশকের বাংলা সাহিত্যের নানা দিকেই এটা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল। তাঁরই পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেখতে পাই সেকালের পত্র-পত্রিকা, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও আলোচনার মধ্যে দিয়ে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি কল্লোলের কাল থেকে উপন্যাসে উঠে এসেছিল।

বিশ শতকের প্রথম থেকে বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের জীবন-যাত্রাতেও পরিবর্তন দেখা গেল। শুধু আর্থিক ক্ষেত্রেই নয়, পরিবর্তন লক্ষ করা গেল তাদের চিন্তাভাবনায়, ও মানসিকতায়। বিশ শতকে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে একটা বলিষ্ঠ বেগ সহজেই নজরে পড়ল, যে বেগ জাতীয় জীবনে সংস্কৃতি আনে এবং নবজাগরণ ঘটায়। বিশেষ করে নূতন চেতনা দেখা দিল দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে। পরিবর্তনটা কোথায় ঘটল তা একটু লক্ষ করে দেখা দরকার।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৯ খ্রীঃ) শেষ হতে না হতেই মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ডের (১৯২০ খ্রীঃ) সংস্কার পরিকল্পনা বাংলা দেশের অর্থনীতিতে দুরবস্থা এনেছিল। এই সময় বাঙ্গালীর আয়ের পথ ও চাকুরী প্রায় বন্ধ হয়ে যায়, ফলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সব দিক থেকেই তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই হতাশাময় যন্ত্রণাকে গান্ধীজী ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতীয় আন্দোলনের রূপ দিয়েছিলেন। এর ফলে সারাদেশে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে তীব্র আন্দোলনে সামিল হয়। বাঙ্গালী জীবনে এক নব উন্মাদনা দেখা দেয়। এই উন্মাদনা শহর ও নগরে বেশি প্রত্যক্ষ করা যায়। এই সময় বাঙ্গালী ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের চেতনা নূতনভাবে উদ্বুদ্ধ হলো। ফলে অসহযোগ আন্দোলন সেদিনের বাঙ্গালীর মনে গভীর হতাশার মধ্যেও এক আশার বাণী বয়ে এনেছিল। তাদের মধ্যে অবরুদ্ধ ও যন্ত্রণাময় জীবন থেকে বেরিয়ে আসার প্রচণ্ড উৎসাহ দেখা যায়। মধ্যবিত্ত জীবনের যন্ত্রণা সেদিনের বাঙ্গালীকে একটা নূতন দিকে ঠেলে দিয়েছিল। চারিদিকে অবিশ্বাস ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে একটা বিশ্বাস ভঙ্গের যন্ত্রণাময় রূপ দেখা গেল। এই বিপর্যয় থেকে কৃষিও বাদ যায় নি। কৃষি জীবনের আর্থিক সংকটের ফলে ছেলে মেয়েরা প্রচলিত নিয়ম-নীতির বাইরে যেতে অস্থির হয়ে উঠেছিল। বাঙ্গালীদের কৃষির সঙ্গে সম্পর্ক যতই কমতে লাগলো, ততই বাঙ্গালী মধ্যবিত্তরা চাকুরীমুখী হয়ে পড়ল। বৃত্তিমুখী পেশা কমতে লাগল এবং ততই তার মানসপটে নিঃশব্দে একটি পালাবদল ঘটে যেতে লাগল। সেই সঙ্গে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থাও অতীতের সঙ্গে পরিবর্তন রেখে চললো, তবে এই পরিবর্তন জাতীয় ঐতিহ্য ও জাতীয় অতীতকে একেবারে অস্বীকার করে না। কালের নিয়মে কোন সমাজ অর্থনীতিই চির শাশ্বত নয়, একদিন ভাঙতেই পারে। কিন্তু এই ভাঙ্গনের মধ্যে দিয়েই সূচিত হয় নূতন সমাজ, সম্পর্ক, জীবন যাত্রা ও মানুষ সম্পর্কে মূল্যবোধ। বাঙ্গালী মধ্যবিত্তরা অনেকটা সেই পথে চলতে লাগল। তারা একান্তভাবে চাকুরী মুখী হয়ে গ্রাম জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ও মানসিক দিক দিয়ে ছিন্নমূলও হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এই পরিবর্তনের বিকল্প ব্যবস্থা তখনও গড়ে উঠল না। খানিকটা ইংরেজ আশ্রিত সমাজের কালচারে বাঙালী মধ্যবিত্তরা কোন কূলেই অবস্থান করল না। শহুরে মধ্যবিত্তদের মধ্যে এই বিচ্ছিন্ন মানসিকতা প্রবলভাবে দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথ এর জন্য দায়ী করেছেন ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে। তিনি "শিক্ষার অসন্তোষ" প্রবন্ধে এই বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন। ক্রমে গুরুত্ব পেল ইংরাজী শিক্ষা, তবে ইংরাজী ভাষায় অন্ধ হয়ে বাঙ্গালী তখন নিজেকে ছাড়া আর কিছুই দেখল না। ইংরাজী ভাষার দাসত্ব শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। তারা আজ নিজেকেই দেশ মনে করে। ইংরাজী ভাষার

দাসত্ব একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, আরো বড় চাকুরীর টান, শহরের টান, ভূমির সঙ্গে বাঙ্গালীদের বিচ্ছেদের জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল। ফলে একদিকে যেমন ভূমিহারা কৃষকের সংখ্যা বাড়তে থাকে অন্যদিকে শহরে চাকুরীর সংকট - এই দুই প্রক্রিয়ার ফলে আমাদের সমাজের যৌথ পরিবারে ভাঙ্গন ধরেছিল। এই ভাঙ্গনের চিত্র যে সবসময় অশুভ তা বলা যাবে না। ঐতিহাসিক কারণেই সেদিনের যৌথ পরিবারের ভাঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক রীতিনীতি; অনেক জীর্ণ নিয়ম-নীতিরও বিলোপ ঘটেছিল। এটা যেমন যৌথ পরিবারের ভাঙ্গনের আশীর্বাদ তেমনি এর সঙ্গে কিছু অভিশাপ ও অবধারিত ভাবে এসে সেই শূন্যস্থান পূরণ করেছিল। আগে মধ্যবিত্তের স্বার্থের এলাকা ছিল বিস্তৃত পরিবারের মধ্যে অনেকটা ছড়ানো। সেই প্রসারের টান এখন সঙ্কুচিত হলো। ক্রমেই শহুরে চাকুরিজীবি মধ্যবিত্তের স্বার্থের কেন্দ্রগুলি পরিণত হল ছোট পরিবারে, সংকীর্ণ ও এককেন্দ্রিক জীবন ভাবনায়। এতে একদিকে যেমন মানুষের ব্যক্তিত্ব অনেকটা চাপা পড়ে গেল, আবার একই সঙ্গে মুক্তি পেল নারী-পুরুষের অবরুদ্ধ ব্যক্তিত্ব। তারা যেন স্বতন্ত্র প্রশ্রয় খুঁজে পেল। অন্যদিকে তাদের স্বার্থের এলাকা অনেকটা প্রসারিত হল; এবং একান্ত ভাবে মর্যদাও বড় হয়ে উঠবার পথ পেল। ছোট স্বার্থের পথ, আত্মসর্বস্বতার পথ আরো মুক্তি পেল। যদিও এই পরিস্থিতির মধ্যেই আর্থিক দুর্গতি ঘনিয়ে আসে। বিত্তের ক্ষেত্রেও দেখা দিল প্রতিযোগিতা। সুযোগের তুলনায় প্রতিযোগী বাড়তে থাকে। তখন জীবন যুদ্ধের তাড়নাতেই মূল্যবোধের ভাঙ্গন ধরে। চাকুরীতেও একই ধরনের দিক ফুটে ওঠে। পদের তুলনায় প্রার্থীর সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল। বেকার সমস্যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অধিকাংশ পরিবারকে স্পর্শ করতে থাকল। এর ফলে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা বা দুর্যোগ বাঙ্গালীদের জীবনে আরো বেশি ঘনীভূত হয়ে আসে। ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য মনুষ্যত্ব এক ক্ষুদ্র অনুতে পরিণত হয়। স্বাভাবিকভাবেই মানবিক মূল্যবোধ অবধারিত ভাবে ক্ষয় পেতে থাকে।

এই ভাবে উনিশ শতকের বাঙ্গালীর সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যা ছিল, বিশ শতকে সেই ধ্যান ধারণাগুলির মৌলিক বদল ঘটতে আরম্ভ করলো। এই পরিবর্তনের আরো একটা কারণ ছিল উনিশ শতকের উচ্চ বর্ণের বাঙ্গালী হিন্দুদের বর্ণ-বৈষম্য প্রথা, যার ফলে উচ্চবর্ণরা সব দিক থেকেই প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেল। তখন পেশার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ছিল না বললেই চলে। মুসলিম প্রতিযোগী তাদের সঙ্গে তেমনিভাবে উঠে না

আসায় অনুন্নত বর্ণের হিন্দুরাই উচ্চবর্ণের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালো। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা চাকুরীর সুযোগই শুধু নয়, নূতন ইংরাজী শিক্ষার প্রবাহকে পুরোপুরি গ্রহণ করল। এই প্রবাহ সারা ভারতবর্ষেই বয়ে চলে। বিশ শতকের গোড়াতেই এই চিত্রের পরিবর্তন এসেছিল। শিক্ষা শুধুমাত্র উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যেই শুধু আবদ্ধ থাকল না। চাকুরী ও বিত্তের ক্ষেত্রেও নিম্নবিত্ত ও মুসলমানদের কিছু অংশের মধ্যে ক্রমে আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। তখন সমাজের উচ্চ ও নিম্ন সকলের কাছেই একটা শক্ত প্রতিযোগী মনোভাবের উদয় হলো, পেশা ক্রমশঃ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়লো। এমনকি কেরানিগিরিও তখন সুলভ নয়। বিভিন্ন প্রদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়েছিল।

পরিস্থিতি পরিবর্তনে ব্যক্তির মানসিকতার বদলটাও স্বভাবতই সাহিত্যে তার ছাপ ফেলেছিল। বিশেষ করে পড়েছিল গল্প ও উপন্যাসে। এই ছবি শরৎচন্দ্রের বড় গল্প বা উপন্যাসে খুব সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। অন্তর্মুখী জীবনের প্রতি মুগ্ধতা, সেই সঙ্গে দেশীয় সংস্কৃতির বিচ্ছেদের ছবি পাওয়া যায় "কল্লোল", "প্রগতি", "কালিকলম" প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় অনেক লেখকের রচনায়। তাদের রচনার বিষয় ততটা না থাকলেও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিতে সেটা ছিল অন্যরকম। ব্যক্তিগতভাবে তখনকার সাহিত্যের নর-নারীরা সকলেই কম বেশী ইংরাজী বিদ্যায় উচ্চ শিক্ষিত, মনেপ্রাণে পাশ্চাত্য অভিমুখী, মনেপ্রাণে নাগরিক অথবা নাগরিক হবার প্রয়াসী, কিছুটা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা থেকে ছিন্নমূল হবার আকাঙ্ক্ষাও লক্ষ করা যায়। নিজেদের বিচ্ছিন্নতাকে এরা বিচ্ছিন্নতা হিসাবে গণ্য না করে আধুনিকতা হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন। বিচ্ছিন্নতাই যে এদের গল্প উপন্যাসের বিষয়বস্তু এমন নয়, কিন্তু নিজেদের বিচ্ছিন্নতার প্রভাব সে সময়কার লেখকদের অর্থাৎ কল্লোলকালের লেখকদের উপন্যাসে দেখা যায়। স্বভাবতঃ এঁদের গল্প উপন্যাসে দেখা গেল ব্যক্তি প্রধান ঘটনা। সমাজ সেখানে নিশ্চিন্তভাবে ছিল গৌণ। কারণ কোন লেখকের উপন্যাসে প্রথম থেকে শেষের বিষয়ভাবনা এক থাকে না। কল্লোলের লেখকদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। যেমন রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের উপন্যাসের থেকে ও শেষের দিকের উপন্যাস পর্যন্ত পরিবর্তন সহজেই লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের "রাজর্ষি" উপন্যাসে যা দেখালেন, নিশ্চয়ই তাঁর "গোরা" উপন্যাসে তা দেখা যায় না। "গোরা"তে সমাজ সংস্কারের কিছু দিক উঠে আসতে দেখা গেল। এর তুলনায় "চতুরঙ্গ" ও "শেষের

কবিতা" অনেক আধুনিক, কিন্তু এই উপন্যাসগুলি অনেকটা রক্তহীন ও সমাজ বিস্মৃত বলা যায়।

বিশ শতকের সমস্ত লেখকই যে সমানভাবে ছিন্ন মানসিকতা, সমানভাবে পাশ্চাত্যের প্রতি ঝোঁক ছিল এমন নয়, তবে এই সময়েই সাহিত্যে যে একটা পরিবর্তন ঘটতে চলেছে তা কোন লেখকই অস্বীকার করতে পারেন না। বিচ্ছিন্নতা, নাগরিক মনস্কতা, পাশ্চাত্য অভিমুখিতা, ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা- এই লক্ষণগুলি দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্যে ফুটে উঠতে আরম্ভ করল। আরো নির্দিষ্ট করে বললে, "কল্লোল" থেকেই এই নূতন ভাবধারার আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে মনে হয়। তবে "কল্লোল"এর কালের সব লেখকই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, বা সকলেই অতিআধুনিক বলে পরিচয় দিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। সুতরাং প্রচলিত এক বিশেষ লেখকগোষ্ঠীর পাশাপাশি একটা বিপরীত বলয়ে এক বিশেষ গোষ্ঠীর লেখককুল তাদের উপন্যাস সাহিত্য রচনা করে চলেছিলেন। এঁদের রচনার সময় অন্য কথাসাহিত্যিকরাও সমানভাবে গল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁরা প্রবলভাবে কল্লোলীয় আদর্শের জয় গান করেন নি। এই সময়টা অবশ্যই দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময় ছিল। বলা বাহুল্য, এঁরা বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে একবারে প্রথম সারির ছিলেন। বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখদের উপন্যাসকে যদি আমরা এই পর্যায়ে ধরি তাহলে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) এঁরা কেউই তেমন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নন, কেউই পাশ্চাত্য অনুকারী লেখক নন, আবার তেমনভাবে নাগরিক মনস্কও নন। উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধির মধ্যে একটা বৈচিত্র্য দেখা গেল, এর ফলে বাঙ্গালী রাজনীতিতে তার প্রভাব পড়তে থাকল। উনিশ শতকের শেষ ভাগে এ বিষয়গুলি অস্ফুট ছিল, বিশ শতকের প্রথম দশকে তা অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে উঠল। সঙ্গতকারণেই দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালে বাঙ্গালীর মধ্যে জীবন অনেকটা হতাশার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিল। এই হতাশার অন্যতম আত্মপ্রকাশ হয়েছিল সেদিনের চরমপন্থী রাজনৈতিক কর্মপ্রয়াসের মধ্যে। এর অর্থ এই নয় যে, বাংলার বিপ্লবীদের সবটাই হতাশার রাজনীতি, কিন্তু এই রাজনীতিতে অর্থনৈতিক অবক্ষয় যুক্ত থাকায় সমাজ মনের ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল সেইকালের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। এতে মানুষের বিশেষ ভাবনার প্রভাব লক্ষ্য করি। এসময় সমাজে দেখা গেল দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, ক্রোধ, ক্ষোভ, প্রতিহিংসা, দুঃসাহস ও রোমান্টিক উদ্দামতার

বৈশিষ্ট্যগুলি। এই সময় আরো দেখা গেল প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কার সশস্ত্র বিপ্লবের প্রভাব, অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতায় বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন (১৯৩০ খ্রীঃ), মেদিনীপুরের সন্ত্রাসবাদী কর্মধারা যেমন ছিল, তেমনি ছিল তারুণ্যের বেহিসাবী বীরত্ব ও আত্ম বলিদানের স্পৃহা। একই সময়ে চলছে রাজনৈতিক আন্দোলন, তার একটি হল কংগ্রেসের আন্দোলনের কার্যকলাপ; অপরটি পরবর্তীকালে তরুণদের সন্ত্রাসবাদী পন্থার সশস্ত্র বিপ্লবের অন্দোলন। এর প্রেক্ষাপটে তরুণ কথাসাহিত্যিকদের মনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনাগুলি গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল, তাদের মনকে অনেকটা দিশেহারা করে তুলেছিল। এছাড়া ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সাম্যবাদী আন্দোলন এই তরুণ কথাসাহিত্যিকদের প্রভাবিত করেছিল। এর পরবর্তীকালে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় কমিউনিষ্ট আন্দোলন তারা অন্তরে অনুভব করেছিলেন। তাঁরা শ্রমজীবি মানুষের জীবন কাহিনী সেকালের পত্র পত্রিকায় তুলে ধরেছিলেন। ফলে এই মার্ক্সবাদ আন্দোলন সেকালের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি মহলে প্রসার লাভ করেছিল। বাংলা কথাসাহিত্যকে প্রচলিত জীবনের সঙ্কীর্ণতা থেকে তাঁরা মুক্তি দিয়েছিলেন। জীবনের বিভিন্ন জটিল সমস্যাকে তাঁরা তাঁদের লেখায় তুলে ধরলেন।

এইকালপর্বে আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বের। সেকালের লেখকদের বিখ্যাত গ্রন্থগুলি যুদ্ধক্লান্ত স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে বিষন্ন বাঙ্গালী তরুণ চিত্তকে নূতন কৌতূহলে উজ্জীবিত করে তুলেছিল। কল্লোলের লেখকরা মানুষের মনের অচেতন ও সুপ্ত সত্তাকে কথাসাহিত্যে তুলে ধরলেন। আর অনিবার্যভাবেই সেদিনের উপন্যাসে উঠে এল যৌনতা। নর-নারীর রোমান্টিক প্রেমের এই যৌনতা নূতন রূপে কথাসাহিত্যিকরা তুলে ধরলেন। এই, দেহ কামনা বা যৌন চেতনা পূর্ববর্তী লেখকদের রচনায় তেমনভাবে স্বীকৃতি পায় নি। কিন্তু কল্লোলের কথাসাহিত্যিকরা প্রেম সম্পর্কে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের যৌনতার ব্যাখ্যা বিশেষভাবে অনুসরণ করলেন, যা সেকালের সাহিত্যের আমূল পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। প্রেমের নূতন চেতনা বাস্তবের মাটিতে পা রাখল। সেকালের বাংলাদেশের যুবসমাজের চিন্তা ও শিল্প ভাবনাকে এই ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব আরো সুদৃঢ় করেছিল। চিন্তা, চেতনা ও কৌতূহল সেদিনের তরুণ সমাজকে হতাশা ও অবসাদ থেকে মুক্তি দিয়েছিল।

দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ভাবধারার সঙ্গে এই সময়ে ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারা ও অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সংমিশ্রণ বাঙালীদের মনে দেখা দিয়েছিল। এই সময় বাঙালীদের মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি আগ্রহও খুব বেশি পরিলক্ষিত হয়। ফলে বাঙালীদের মনে প্রচলিত মূল্যবোধ ও জীবন দৃষ্টির পরিবর্তন দেখা দিল। এই সময় বাংলার তরুণ কথাসাহিত্যিকদের মনে প্রচলিত মূল্যবোধ ও জীবনের পরিবর্তন দেখা দিল। এই পরিবর্তনে পাশ্চাত্য সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল এ কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এ প্রসঙ্গে আরো সংযোজন করা যায় যে, বাংলা কথাসাহিত্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রও অনুসরণ করেছিলেন। তিনি স্কট, লর্ড লিটন, উইলিয়াম কলিন্সএর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের লেখায় বিদেশী প্রভাবের কথা তেমনভাবে খাটে না। বিদেশের উপাদান নিয়ে তিনি কখনই কিছু লেখেন নি। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে তরুণ কথাসাহিত্যিকরা বিদেশি সাহিত্যে বেশি মনোযোগী হয়ে পড়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে সজনীকান্ত দাস লিখেছেন –

"প্রথম মহাযুদ্ধের আলোড়ন শেষ হইলে দেখা গেল, ইউরোপীয় সাহিত্যের উদগ্র বস্তুবাদ উগ্রমূর্তি লইয়াই বাংলার অঙ্গনে প্রবেশ করিতেছে। ঠিক এই অবস্থায় আমিও কন্টিনেন্টাল সাহিত্য পাঠ লইতেছি। ইব্‌সন, মেটালিঙ্ক, ষ্টীন্টবার্গ, টুর্গেনিভ, টলষ্টয়, ডষ্টয়ভস্কি, লিনান্সকি, বোয়ার, ক্লুট, হ্যামসুন - বঙ্গবাসীর নিরামিষ অঙ্গনে তাজা রক্তের ছাপ পড়িতেছে। সে কি উত্তেজনা, কি উম্মাদনা। সেই ঢেউই চলিল "কল্লোল", "কালিকলম", "প্রগতি", "উত্তরা " পর্যন্ত।" – ৬

এই ভাবে পাশ্চাত্য ভাবধারার ঝাঁঝালো স্বাদ সমকালের সাহিত্য পত্রিকা 'কল্লোল'এ প্রবল হয়ে উঠেছিল। কথাসাহিত্যের বিষয়ভাবনা, জীবনাদর্শ ও শিল্প ভাবনায় দেখা দিল নূতন রূপ ও চেতনা। এই নূতন ও বিচিত্র জীবনের পরিচয় "কল্লোল" গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। এই সূত্রে তাঁরা নিজেকে অতিআধুনিক বলেও অনেকে মনে করতেন। যার ফলে বিদেশি লেখকদের শিল্প ভাবনা তাঁদের রচনায় দেখা দিল। কল্লোলগোষ্ঠীর লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন –

"জীবনকে দেখবার পাঠ নিতে যদি হ্যামসুন গোর্কীর পাঠশালায় গিয়ে থাকি, তাতে দোষ কি ? এতদিন তাদের সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের বড় বেশি সম্পর্ক ছিল না। জীবনকে দেখবার দৃষ্টি ছিল যে দুর্লভ।" - ৭

"কল্লোলগোষ্ঠী"র লেখক বলতে যে সব সাহিত্যিক এই পত্রিকায় লিখেছিলেন তাঁদের সকলকেই বুঝায়। আবার এমন অনেক সাহিত্যিক আছেন যাঁদের লেখা "কল্লোল" এ খুব কম প্রকাশিত হলেও তাঁরা "কল্লোল" বহির্ভূত নয়। ফলে "কল্লোল" এ প্রকাশিত লেখা দিয়ে বিচার করা যায় না। সুতরাং কল্লোল হলো সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র ভাবধারা। যারা জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কিছু নূতনত্ব ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। "কল্লোল" ছিল সমস্ত দিক থেকে একটা নাড়া দেওয়ার উদ্যোগ। এইভাবে নাড়া দেওয়ার উদ্যম সেকালের "কল্লোল" পত্রিকার মধ্যে দিয়ে লেখকরা তুলে ধরেছেন। তাঁদের লেখায় প্রচলিত নিয়ম নীতি, আদর্শবাদ ও প্রেম সম্পর্কে একটি রবীন্দ্র বিরোধিতার মানসিকতা ছিল। এছাড়া উপন্যাস গল্পের মধ্যে দেখা দিয়েছিল দরিদ্র, নিম্ন মধ্যবিত্তের সংসার ও তাদের জীবনের বিভিন্ন কার্যকলাপ। কয়লাকুঠীর বস্তি মানুষের জীবন কাহিনী সেকালের লেখকদের উপন্যাসে উঠে এল, রবীন্দ্রনাথে এই রিয়ালিজম ছিল না বললেই চলে। এছাড়া কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের রচনায় একটি ভাঙ্গনধর্মী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। পুরোনোকে ভেঙ্গে ফেলার তীব্র মানসিকতা তাঁদের মধ্যে দেখা গেল। এর সঙ্গে ছিল সেকালের লেখকদের রোমান্টিকতা। অচিন্ত্যকুমার এ প্রসঙ্গে বলেছেন -

"কল্লোলে সে যুগটাই ছিল সাহসী যুগ, সে সাহস রোমান্টিসিজমের মোহ মাখানো।"
- ৮

এই মনোভাব প্রসঙ্গে কল্লোল যুগে যেসব লেখক ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন তাঁরা হলেন অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত, গোকুলচন্দ্র নাগ, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি লেখকরা। তাঁরা রোমান্টিক চেতনার সঙ্গে সমাজের অবৈধ প্রেমের ও যৌনতাকে সাহিত্যে এক বিশিষ্ট ভঙ্গিতে তুলে ধরলেন। এঁদের উপন্যাসের নর-নারীরা ছিল একটু ভাবুকী, কাল্পনিক জগতের মানুষ। তারা যেন একটি রহস্যে ঘেরা। তাদের মধ্যে ছিল তীব্র যৌন চেতনার আবেগ। তারা সকলেই যেন রোমান্টিক আবেগে ও যৌবনের উচ্ছ্বাসে, অতিকথনে

পারদর্শিতা দেখিয়েছে। এদের মধ্যে কল্লোলের গোকুলচন্দ্র নাগের "পথিক", অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের "বেদে", "বিবাহের চেয়ে বড়ো", "কাকজ্যোৎস্না", "আসমুদ্র" উল্লেখযোগ্য। প্রেমেন্দ্র মিত্রের "মিছিল" এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। এই সব উপন্যাসে দেহচেতনা ও ব্যক্তির সম্পর্কের প্রেমের একটি নূতন রূপ ধরা পড়ে, যা বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত এই দীর্ঘ পর্বের কথাসাহিত্যে সেই প্রেমের ছবি থাকলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালের এই সব লেখকদের রচনাই সমাজের বিরুদ্ধে এক তীব্র নেতিবাচক মানসিকতা লক্ষ করা যায়, যা ছিল কথাসাহিত্যে নূতন চেতনা বা ধারা। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে বাংলা কথাসাহিত্যের পটভূমিতে নগর চেতনাকে হাতিয়ার করে একটি আধুনিকতার জোয়ার এসেছিল। শরৎচন্দ্রের মধ্যে পল্লী বাংলার জীবনের পটভূমি থাকলেও নায়ক নায়িকার চরিত্রের এই বিশিষ্ট দিকগুলি একটু জটিলভাবে আশা-নিরাশায়, আলো-আঁধারের ক্ষয়িষ্ণু নাগরিক সমাজের স্বরূপটি তেমনভাবে ছিল না। এই রূপটি কল্লোলকালের লেখকদের রচনায় তীব্রভাবে দেখা গেল।

উপন্যাসের এই নূতন ধারার মোহে যাঁরা পা দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, মণীন্দ্রলাল বসু, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র গুপ্ত, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রভৃতি জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকদের নাম করা যেতে পারে। এঁদের মধ্যে অনেকে তাদের কালেই জনপ্রিয় হয়েছিলেন। কেউ ছিলেন কথাসাহিত্যিক আবার কেউ বিখ্যাত কবি। এছাড়া "কল্লোল" চেতনায় নূতন ধারা যারা এনেছিলেন তাঁদের মধ্যে জগদীশচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫২ খ্রীঃ) ও নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪ খ্রীঃ) অন্যতম। তাঁরা মণীন্দ্রলালের রোমান্টিসিজমের পথ ধরে "কল্লোল" চেতনাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করেছিল। তাঁরা "কল্লোল" এর তৎকালীন লেখকদের তুলনায় বয়সে অনেক বড় ছিলেন। জগদীশচন্দ্র গুপ্ত "কল্লোল" এর কালের অতি আধুনিক তরুণদের তুলনায় অনেক প্রবীন হলেও তাঁকে কল্লোলীয় বলে ধরা যায়। জগদীশচন্দ্র গুপ্ত অবশ্য অনেক বেশি বয়সে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেছিলেন। "কল্লোল" প্রকাশের সময় তাঁর বয়স ছিল সাঁইত্রিশ বছর। বলা বাহুল্য, জগদীশচন্দ্র গুপ্ত, শরৎচন্দ্রের কালেই আবির্ভূত হয়েছিলেন কিন্তু তিনি কল্লোলের স্রোতেই গা-ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি

মানুষদের নিয়ে লিখেছিলেন। জগদীশচন্দ্র এই নীচুতলার মানুষদের আচার-আচরণের জীবন্ত ও বেপরোয়া বাস্তববোধকে উপন্যাসে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর উপন্যাসে নারীর বন্ধন থেকে মুক্তির প্রয়াস লক্ষ করা যায়। সমাজে নারী যে শুধু অসহায় নয়, তাদের বিচিত্র মনের বাস্তব ছবি তিনি উপন্যাসে তুলে ধরেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র নারীকে যে বন্ধনে রেখে বিচার করেছেন, তিনি তা থেকে একটু স্বতন্ত্র ছিলেন। নারী মনের প্রশ্নে জগদীশচন্দ্রের মতো নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত একই মনের অধিকারী। তাঁর উপন্যাসে সেক্সঘটিত সত্যতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এছাড়া সাম্যবাদী আদর্শের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি তাঁর উপন্যাসে উঠে এসেছিল। মানুষের জীবনে যৌনতা যে একটা প্রবল সত্য - একথা তাঁর উপন্যাসে একাধিকবার দেখা যায়। যাকে অনেকটা ফ্রয়েডীয় ধ্যান-ধারণার সাদৃশ্য বলা যেতে পারে। মানুষের জীবনে সেক্স একটা বড় শক্তি, যে শক্তি সমাজের প্রচলিত ধারাকে তছনছ করে দেয়, এই শক্তিকে অস্বীকার করলে বাস্তবকেই অস্বীকার করা হয়। এছাড়া এই শক্তির অস্তিত্ব ও প্রভাবকে স্বীকৃতি না দিলে মানুষের সমাজ জীবনের অনেকটাই অস্বীকার করা হয়। বাংলা উপন্যাসে এই তত্ত্বটি প্রথম সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ পেয়েছে নরেশচন্দ্রের উপন্যাসে। নরেশচন্দ্রের উপন্যাসে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আকর্ষণও লক্ষ করা যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে "শুভা" (১৯২০ খ্রীঃ) "ছাপ" (১৯৩২ খ্রীঃ) প্রভৃতি উপন্যাসের নাম করা যেতে পারে। নরেশচন্দ্রের "শুভা" উপন্যাসে বুদ্ধিমতি, ব্যক্তিত্বময়ী তরুণী শুভার স্বামীর গৃহত্যাগের মধ্যে দিয়ে জীবনের সার্থকতা লাভের দুঃসাহসী অভিযানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের দাম্পত্য জীবনে প্রেম ছিল না। ফলে এক সময় তাদের জীবন অর্থহীন হয়ে উঠল। আবার "রক্তের ঋণ" উপন্যাসে রক্তের বন্ধনে বংশ-জাতির মর্যাদা গুরুত্ব পায় নি। নরেশচন্দ্র এই উপন্যাসে যৌন শক্তির অবিসংবাদিত রূপটি তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে সাম্যবাদী আদর্শের ছবি ফুটে উঠেছে। সমাজ সংস্কারের ভাবনা এখানে কাজ করেছে। তাঁর উপন্যাসে আরো দেখা যায় অপরাধ, শঠতা, মিথ্যাচার ও নিষ্ঠুর জীবনের জটিল-কুটিল অন্ধকারময় জীবন। তার সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের মিল ছিল সহনশীলতার, তবে উভয় লেখকই জীবনে যৌনতা যে প্রবল শক্তি - এটাকে অস্বীকার করেন নি। আবার নরেশচন্দ্রও সাম্যবাদী আদর্শের দিকটাও অস্বীকার করেন নি, তবে নরেশচন্দ্র ছিলেন তাত্ত্বিক লেখক। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি রক্ত-মাংসের জীবন্ত মানুষ মনে হলেও তারা মাঝে মাঝে ম্লান হয়ে এসেছিল। নরেশচন্দ্র উপন্যাসে যা দেখিয়েছিলেন, তা অবশ্যই নূতন ধারার ইঙ্গিত বহন করে। জগদীশচন্দ্রের উপন্যাসের নূতনত্ব এসেছিল প্রতিকুল পরিবেশের বিরুদ্ধে। এছাড়া চরিত্রগুলির সংগ্রামে এসেছিল ব্যর্থতা। চরিত্রগুলি

ছিল ট্রাজেডি ভারাক্রান্ত। জীবনের অনন্ত পথ বেয়ে চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলি যেন উঠে এসেছিল -

"কিন্তু সুন্দরী ততক্ষণে জাগিয়া উঠিয়াছে- সে লাফাইয়া উঠিল- এবং বিস্ময়ে রুদ্ধবাক নারীর কণ্ঠ সহসা খুলিয়া যাইয়া যে শব্দ নির্গত হইল তাহা কেবল সুন্দরীর কণ্ঠেই সম্ভব। ওরে আমার সোয়ামী-উলি, বেরো বলছিস কাকে তুই ? কার ঘরে তুই আছিস জানিস ? যেতে যেতে দাঁড়িয়ে ফিরে স্বামীর স্বত্ব জাহির করলি তুই ? আমার সামনে দাঁড়িয়ে?

বলিতে বলিতে সুন্দরী অগ্রসর হইতে লাগিল.....।

অচিন্ত্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,- আহা, থাম।

কিন্তু তাহার পর সুন্দরী আরো কিছু বলিল কিনা তাহা টুকী জানিতে পারিল না।

সুন্দরীর বাড়ী চৌকাঠ পার হইয়া সে বাহিরে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে যাইয়া দাঁড়াইল।" - ৯

এই ভাবে সে সময় "লঘু-গুরু" উপন্যাসে প্রচলিত ধারা থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াস দেখা যায়। যদিও তাঁদের সাহিত্য ও ভাষার মধ্যে তেমন কোন স্বকীয়তা ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের ভাষাকে যে মহিমায় তুলে দিয়েছিলেন, তা থেকে তিনি অনেক দূরে ছিলেন। জগদীশচন্দ্রের উপন্যাসে সবটাই কল্লোলীয় নয়, এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকলেও মোটামুটিভাবে তাঁকে কল্লোলীয় বলেই ধরা হয়। জগদীশচন্দ্রের উপন্যাসে আপাদমস্তক ঘৃণ্য মানুষের ছবি দেখা যায়। চরিত্রগুলি সত্যই প্রকৃতিগতভাবে ঘৃণ্য ছিল। তাদের নরকের কীটও বলা যেতে পারে। অবশ্য "অসাধু সিদ্ধার্থ" উপন্যাসের নায়ক তাদের গোত্রের নয়। মানুষকে খারাপ, কদর্য পরিবেশ যে কিভাবে কদর্যতার পথে নিয়ে যায় তার পরিচয় আমরা এই উপন্যাসে পাই। মানুষের মূল্যবোধ এখানে পতনের মুখে। পতনের এই পিচ্ছিল পথে মানুষের পক্ষে হঠাৎ গতিরোধ করে ফিরে দাঁড়ানো সম্ভব হয়ে ওঠেনা। নিছক বেঁচে থাকার কঠিন তাগিদের জন্যই তাদের সংগ্রাম বলা যেতে পারে। এই উপন্যাসের নায়ক নটবরের জীবনে একই ঘটনা দেখা যায়। নটবর জন্মগতভাবে অমানুষ নয়, সে লেখাপড়া জানা মানুষ। কিন্তু কদর্য পরিবেশ তাকে কদর্যমুখী করে তুলেছিল। কিন্তু জীবনের এই চূড়ান্ত পতনের মধ্যে থেকে

এখন সে আলোকিত জীবনের স্বপ্ন দেখে। এতে তার প্রাণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই আলোক পিপাসাই তার মনুষ্যত্বের অভিজ্ঞান, আর এখানেই এসেছে নিয়তির আঘাত। শেষ মুহূর্তে কাশীনাথ এসে উপস্থিত না হলে নটবর হয়তো নিজের সিদ্ধান্তেই অবিচল থাকতো। তাই বলতে পারি, জগদীশচন্দ্র ও নরেশচন্দ্র দুইজন ঔপন্যাসিকেরই রচনায় দেখা যায় নারীর বড় সম্পদ হল যৌনতা। এই সম্পর্কেই কল্লোলের লেখকদের নাড়াচাড়া করতে দেখা যায়। সামাজিক ও রাজনৈতিক বাধা, অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা তাদের পথে কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তাই এই নূতনধারা সমাজের গতিপথে একটা দাপট নিয়ে এল। তারা ভেঙ্গে দিল হীনমন্যতার বন্ধন। এই ভাঙ্গন ছিল প্রগতিশীল ভাঙ্গন, যাকে নূতন বিষয় ভাবনা আনার প্রয়াস বলা যায়।

প্রচলিত ধারার প্রেক্ষাপটে আধুনিকতা যারা আনলেন তাদের মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় , তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। এই তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে বিভূতিভূষণ (১৮৯৪-১৯৫০ খ্রীঃ) ছিলেন বয়সে বড়। তাঁর চার বছরের ছোট ছিলেন তারাশঙ্কর (১৮৯৮-১৯৭১ খ্রীঃ)। তারাশঙ্করের থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত এই ১০ বছরে অনেক কথাসাহিত্যিককে দেখা যায়। যাঁরা প্রকৃতিগতভাবে কল্লোল চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎ চন্দ্রের পর একটি নূতন ধারা আনতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, যাঁরা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটি নূতন ভাবাদর্শও আনার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা বিহ্বল ভাববিলাস, যৌনতা যে চরিত্রের জৈবিক ধর্ম, এই ভাবনা বিশেষ করে মধ্যবিত্ত জীবনের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসে তুলে ধরেছিলেন। এই সময়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সেই সুর এসেছিল প্রবলভাবে। তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনার আগে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬ খ্রীঃ), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০২-১৯৬৪ খ্রীঃ), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮ খ্রীঃ) ও বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪ খ্রীঃ) আলোচনা প্রসঙ্গে এসে যায়। তবে মোটামুটি ভাবে এরা কল্লোলের সময়কার জনপ্রিয় কথাশিল্পী ছিলেন। কল্লোলীয় চেতনা প্রবলভাবে যাদের নাড়া দিয়েছিল অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব ও প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বাংলা কথাসাহিত্যে তিন-বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন জনপ্রিয় কথাশিল্পীর মর্যাদা পেয়েছিলেন তেমনি অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র ও বুদ্ধদেব জনপ্রিয় কল্লোলীয় গোষ্ঠীর লেখক হিসাবে খ্যাতি পেয়েছিলেন।

এখন কল্লোলীয় গোষ্ঠীর লেখকদের সম্পর্কে আলোচনার আগে বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্করের মধ্যে কল্লোলীয় চিন্তা-চেতনার মধ্যে দিয়ে উপন্যাসে নূতন ধারা কতটা প্রতিফলিত হয়েছিল সেই দিকটা দেখা প্রয়োজন।

বিভূতিভূষণের বিখ্যাত উপন্যাস যখন "পথের পাঁচালী" ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, সেই বছরই "কল্লোল" পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল। এই সময় রবীন্দ্রনাথের "যোগাযোগ" ও শরৎ চন্দ্রের "শেষ প্রশ্ন" রচিত হয়েছিল। ঠিক একই সময়ে বিভূতিভূষণের উপন্যাসে দেখা গেল জ্বালাহীন দরিদ্রতা। সেই সময়ের সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবেশে চরিত্রগুলিকে বিদ্রোহী হতে দেখা যায় না। তারা নিস্পৃহ মনোভাব নিয়ে যেন বিচরণ করছে, তাদের মধ্যে রোমান্টিক স্বপ্নের প্রভাব অধিকভাবে লক্ষ করা যায়। চরিত্রগুলির মধ্যে নারী মনের ভালোবাসা এসেছে, তবে তা দুরন্তভাবে নয়। প্রকৃতির বুকে বিচরণকারী মানুষদের ভালোবাসাকে তারা যেন বাস্তবের মাটিতে এনেছিলেন। সেই সঙ্গে সভ্যতা বঞ্চিত হত দরিদ্র নিম্ন শ্রেণীর আদিবাসী জীবন বিভূতিভূষণের উপন্যাসে দূরন্তভাবে প্রকাশ পেল। এই আদিবাসী জীবনের ক্ষুধা ও বঞ্চনার ছবি বিভূতিভূষণ তাঁর "আরণ্যক" উপন্যাসে তুলে ধরেছিলেন। -

"আমারা কথায় বলি - দুমুঠো ভাতের জন্য। ভাত কি সহজ কথা ? তার জন্য অনেক পয়সা চাই। পয়সা কোথায় ?

এ দেশে পয়সা জিনিসটি বাংলাদেশের মত সস্তা নয়, এখানে আসিয়া পর্যন্ত তা দেখিতেছি। শুকনো কাশ ও সাবাই ঘাসের ছোট্ট একটা ছাউনি কেঁদ ও আমলকির বনে, সেখানে বড় একটা মাটির হাঁড়িতে মকাই সিদ্ধ করিয়া কাঁচা শালপাতায় সকলে একত্রে খাইতে বসিয়াছে.....।" - ১০

অবশ্য বিভূতিভূষণের শেষের দিকের উপন্যাসগুলিতে প্রকৃতি চেতনা অনেকটা ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। তাঁর সমগ্র উপন্যাসে মাটির মানুষের কথা বার বার উঠে এসেছিল। আর এখান থেকেই উপন্যাসে প্রচলিত ধারাকে উপেক্ষা করে এক নূতন ধারার সুর ভেসে আসে, যদিও সচেতনভাবে বিভূতুভূষণ কল্লোলীয় গোষ্ঠী থেকে অনেক দূরে ছিলেন। তাঁর

অনেক উপন্যাসে প্রাচীন সমাজ ভাবনার ও বংশমর্যাদার কথা বারবার ফুটে উঠতে দেখা যায়।

বিভূতিভূষণের সময়কালে আরেক জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে দেখা যায় রাঢ় অঞ্চলের বিশেষ করে বীরভূমের সমাজ-জীবন ও পরিবেশ। তাঁর উপন্যাসে নরনারীর জীবনের সমস্যা ও সংকট এসেছিল সেকালের রাজনৈতিক অবস্থা থেকে। তাঁর উপন্যাসে সমাজে বড় রকমের পালাবদলের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এছাড়া উপন্যাসগুলিতে গান্ধীবাদের অহিংসার নীতি ফুটে উঠতে দেখা যায়। সুতরাং দীর্ঘকালের একটা সাহিত্যের পরিমন্ডলকে তারাশঙ্করের উপন্যাসগুলি গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তবে তিনি অতীতকালের আঙ্গিককেই উপন্যাসে এনেছিলেন। স্বাধীনতালাভের পর ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তারাশঙ্করের "আরোগ্য নিকেতন" উপন্যাসে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার বিরোধ দেখা যায়। তাঁর মনের রূপান্তর স্বাধীনতার পরবর্তীকাল পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল। উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যে সরলতার ভাব বেশি প্রত্যক্ষ করা যায়। আবার ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত "হাঁসুলীবাঁকের উপকথা" উপন্যাসে বনোয়ারী ও করালীর যে পরিচয় পাই তাতে তারাশঙ্করের মানসিকতার পালাবদলের আভাস পাওয়া যায় -

"অনেকক্ষণ পর অন্ধকারের মধ্যে একটা মূর্তি উঠে দাঁড়াল। গাছতলায় দাঁড়িয়ে একটু সামলে নিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে এল। একজন পড়ে রইল অসাড় ভাবে।
যুদ্ধটা যখন বাস্তব যুদ্ধ নয়, প্রতীকী যুদ্ধও, তখন কার যে জয় হল বোঝা কঠিন নয়।
- তুমি ? - আশ্চর্য হয়ে গেল পাখী।
- হ্যাঁ - বলেই করালী আবার ফিরল, একটা লাথি মারল বনওয়ারীর মাথায়। তারপর ফিরে এসে বলল- চল্ ! .....
সর্বাঙ্গে রক্ত ঝরছে। ক্ষত-বিক্ষত-দেহ বিজয়ী বীর টলতে টলতে চলে গেল।" - ১১

তারপর ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে "আরোগ্য নিকেতন" - এ নূতনত্বের ধারাটি পরিষ্কার হয়ে যায়। এছাড়া তাঁর উপন্যাসে নর-নারীর অবৈধ সম্পর্কের দিকটা বার বার এসেছে। সেই সঙ্গে নিম্নবিত্ত বিভিন্ন মানুষের ছবি উঠে এসেছে। চরিত্রগুলি থেকে পুরোনো জীবনযাত্রা

অবসানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তারাশঙ্করের উপন্যাস লেখার পাশাপাশি "কল্লোল" গোষ্ঠীর তরুণ লেখকদের রচনা এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। "কল্লোল" গোষ্ঠীর লেখকদের আর শুধু রাঢ় অঞ্চলের গ্রাম্য জীবনে আবদ্ধ থাকতে দেখা যায় না। তাঁরা গ্রাম্য জীবন থেকে দূরে, নাগরিক কোলাহলের মধ্যে নিম্ন মধ্যবিত্তের দরিদ্রতাকে তুলে ধরেছিলেন। এঁরা হলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬ খ্রীঃ), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০২-১৯৬৪ খ্রীঃ), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮ খ্রী), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪ খ্রীঃ), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬ খ্রীঃ)। এদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমারের উপন্যাসে সমাজ গৌণ নয়, কিন্তু প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাসেও সমাজের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। অচিন্ত্যকুমার ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের পরিবেশ ছিল বিস্তৃত ও বিচিত্রধর্মী। প্রেমেন্দ্র মিত্রের যতটা নাগরিক জীবনের প্রতি ঝোঁক ছিল অচিন্ত্যকুমারের মধ্যে আবার তা দেখা যায় না। অচিন্ত্যকুমারের গল্প উপন্যাসে গ্রাম্য জীবনের মানুষের কথা মাঝে মাঝে উঠে এসেছিল। তবে নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের বিবরণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় অনেক বেশি এগিয়ে ছিলেন - এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রচলিত সীমারেখা পেরিয়ে বাংলা উপন্যাসকে নূতন পথে পরিচালিত করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত উপন্যাস সাহিত্যের যে ধারা বয়ে এসেছিল অচিন্ত্যকুমার সেই স্রোতে ভেসে না গিয়ে অন্যপথে পাড়ি দিয়েছিলেন। তিনি এই পথে গিয়ে কতটা স্থায়িত্ব লাভ করেছিলেন সেই আলোচনায় না গিয়ে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তিনি উপন্যাসের ভবিষ্যৎ পরিণামের নূতন বিষয়ভাবনা জাগিয়ে তুলেছিলেন। অনেক সমালোচক তাঁর উপন্যাসে কাব্যিকতা ছিল বলে মনে করেন। তবে এই কাব্যভাবনা বাংলা উপন্যাসে নূতন নয়, এর আগে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেও এই কাব্যিকতা ছিল বলে অনেক সমালোচক মনে করেন। শরৎচন্দ্র অবশ্য এই সুর যথাসাধ্য বর্জন করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অচিন্ত্যকুমারের উপন্যাসে চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত ও মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলি কাব্যিকতায় আবদ্ধ ছিল। তবে ভাবনা ও উচ্ছ্বাসের মধ্যে যে তটভূমি ছিল, সেখানেই তাঁর উপন্যাসের নর-নারীদের বিচরণ করতে দেখি। অচিন্ত্যকুমারের "বেদে" (১৯৩৩ খ্রীঃ), "আসমুদ্র" (১৯৩৪ খ্রীঃ) এই উপন্যাসগুলি তাঁর অন্তঃপ্রকৃতি থেকে উৎসারিত হয়েছিল। তাঁর উপন্যাসে এসেছিল দরিদ্রতা। কিন্তু এই উপন্যাসে দরিদ্র মানুষ সুবিচার পায় নি। বিচারের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ, নৈরাশ্য ও

বিদ্রোহ লক্ষ করা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি অচিন্ত্যকুমারের "বেদে" উপন্যাসে পাই। এছাড়া এই উপন্যাসে চরিত্রের বীভৎসতা ও কুৎসিত রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। আবার "আকস্মিক" (১৯৩০ খ্রীঃ) উপন্যাসে বেদের মত বীভৎসতার পরিচয় পাওয়া যায় না, এছাড়া তাঁর উপন্যাসে গণিকা জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। গণিকাদের জীবনযাত্রায় অনুশাসনহীন উচ্ছৃঙ্খলতা লক্ষণীয়। যেমন শশী দামিনীকে খুন করে পালিয়ে যায়। আবার অন্য উপন্যাসে দেখছি মাতালেরা নেশা করে জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারে। এখানে যেন সমাজ নীরব থেকে গেছে। বিবেক-দংশনের কোন বালাই উপন্যাসে দেখি না। নিকুঞ্জের স্ত্রীর গণিকা হতে আশঙ্কা করে, কিন্তু শেষে নিকুঞ্জের স্ত্রী পঞ্চুকে আশ্রয় করে তার নিজের জীবন রক্ষা করেছে। উপন্যাসে পঞ্চুই একমাত্র জীবন্ত চরিত্র। তাদের ঘর বাঁধার আগ্রহ পাঠকদের সমবেদনার সৃষ্টি করে ঠিকই কিন্তু জৈবিক তাগিদই তাদের দাম্পত্য জীবনে অস্থিরতা আনে। আবার "কাকজ্যোৎস্না", উপন্যাসে একদিকে প্রচলিত ধর্ম ও অপরদিকে সমাজ বন্ধনকে ভাঙ্গার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি ভাবুকী ও ভাবপ্রবণ হলেও তাদের চরিত্র চিত্রণে অস্বাভাবিকতা লক্ষ করা যায়। আরেকটি উপন্যাসে দেখা যায় কেন্দ্রিয় নারী চরিত্র নমিতা পূজার ঘরে ঢুকে সবকিছু লণ্ড ভণ্ড করে দেয়। তারপর নমিতার ভাবান্তর ঘটেছে। সে উপন্যাসের নায়ক প্রদীপের জীবন সঙ্গিনী হবার আগ্রহ জানিয়েছে। কিন্তু প্রদীপের কাছে নমিতা প্রত্যাখ্যাত হয়। তার পরেই নমিতার দুঃসাহসিকতা আরো বেড়ে যায়। নারী চরিত্রের মধ্যে প্রেমের এই উন্মাদনা ও প্রেমিকাকে প্রতিশোধ গ্রহণের মানসিকতা অন্য উপন্যাসে খুব কমই দেখা যায়। "প্রচ্ছদপট" (১৯১৪ খ্রীঃ) উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র শ্রীপর্ণা ও নিরঞ্জন। তাদের প্রেম বিরহের কাব্য উচ্ছ্বাসের বিবরণের পরিচয় পাই। তারা স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা চালিত হয়েছে। তাদের দুজনেরই দাম্পত্য জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে, বিচ্ছেদের মধ্যে দেখা গিয়েছে তাদের দুঃখ ও বেদনা। এইভাবে অচিন্ত্যকুমার উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে প্রচলিত ধারা থেকে সরে এসেছিলেন। আবার "উপনয়ন" উপন্যাসটির পরিকল্পনায় অচিন্ত্যকুমারের যৌন ভাবনা দেখা যায়। এই উপন্যাসে একজন তরুণ কবিকে দেখি। এই তরুণ কবি দারিদ্র্যের প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য একজন স্নেহপরায়ণ অভিভাবকের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু কবি জীবনের সমস্যা তার কোনদিনও দূর হয় নি। এর ফলে তার কাব্য জীবনের সঙ্গে ব্যক্তি জীবনের ইতিহাস জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। এছাড়া উপন্যাসে আরো দুটি চরিত্র কুবের ও বেবিকে দেখি। কুবের ও বেবির প্রেমের বৈষম্য দেখা যায়।

বেবি ব্যক্তিত্বময়ী। তার সামাজিক ও পারিবারিক অনুশাসনের প্রতি অবজ্ঞা দেখা গিয়েছিল। এই অবজ্ঞা তাকে স্বামীর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে না দিলেও লেখক অশ্লীল প্রেমের দুরন্তপনা তার মাধ্যমে দেখিয়েছেন। এই উপন্যাসে চরিত্রের পারদর্শিতা, সাহিত্য ও জীবন সম্পর্কে গভীর ও চিন্তাশীল সংলাপগুলি চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ধর্ম প্রকাশে নূতনত্বের পরিচায়ক। তাঁর উপন্যাসে মানুষের বিশ্বাস ভঙ্গের ও মূল্যবোধের রূপান্তর দেখানো হয়েছে। পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধের আবহাওয়ায় লেখা উপন্যাসগুলি কল্লোলের নূতন ধারায় এই পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল- এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে যুব চিত্তে সংশয়, হতাশা দেখা দিয়েছিল। এই ভাবনা থেকেই উপন্যাসের চরিত্রে পরিবর্তন দেখা দিল। অবশ্য তা মানুষের মনুষ্যত্ব বোধের উপর কখনই আঘাত করে নি। তরুণ লেখক গোষ্ঠীর কাছে তা একটি নূতন আশ্বাসের বাণী বহন করে এনেছিল, যা সেকালের তরুণ চিত্তের কাছে অবশ্যই প্রত্যাশিত ছিল। এই মানসিকতা সমকালে প্রেমেন্দ্র মিত্রের মধ্যে এসেছিল, কিন্তু তা অন্যভাবে। তিনি কল্লোলে এক অভিনব ধারা আনলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রধানতঃ কবি এবং কথাসাহিত্যিক। অন্যান্য তরুণ লেখকদের মত তিনি কখনই শুধু রোমান্টিক ভাবনাকেই তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেন নি। জীবনের জটিল ও কদর্য রূপটি উপন্যাসে তুলে ধরেছিলেন। এই রূপের মধ্যে ছিল তীব্র জীবন যন্ত্রণা। তিনি জীবনের ত্রুটি বিচ্যুতিকে মন দিয়ে বুঝতে চেয়েছিলেন। হতভাগ্য তুচ্ছ মানুষের প্রতি সমবেদনা তাঁর উপন্যাসে দেখতে পাই। তিনি কখনই চরিত্রের বিকাশে উচ্ছ্বসিত রোমান্টিক ভাবনা আনেননি, আবার বেদনায় কাতর অশ্রু সজল চিত্তেরও অবতারণা করেন নি। তিনি অনুভব করেছেন তুচ্ছ, নগণ্য, ছন্দহীন জীবনের প্রতি এক গভীর মমত্ব বোধ। প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাসে স্থূলভাবে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাসে হতাশা, ব্যর্থতা ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতার প্রভাব লক্ষ করা যায়। এ থেকে তিনি উত্তরণের পথ হিসাবে সমাজতন্ত্রের বাণীকে বহন করেছিলেন। তিনি "পাঁক" (১৯২৬ খ্রীঃ) উপন্যাসে কুৎসিত বিকৃত পরিবেশের এক বাস্তব ছবি তুলে ধরেছেন, সেই সঙ্গে উত্তরণের পথও নির্দেশ করেছেন। এই উপন্যাসে এক মহান আদর্শের বাণী ফুটে উঠতে দেখা যায়। তিনি বস্তিবাসীর জীবনের ছবি জীবন্ত ভাবে তুলে ধরেছেন। আর এই ছবিতে লেখক আধুনিক জীবনের স্বরূপ উন্মোচন করতে গিয়ে নাগরিক জীবনে প্রবেশ করেছেন। যার ফলে নগর জীবনের বিপর্যয় তাঁর উপন্যাসে উঠে এসেছিল। এই ভঙ্গুর সমাজে মানুষের জীবনাচরণের বিভিন্ন দিক উপন্যাসে এসেছে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নকুড় দাস ও বীনুর রূপান্তরের

কাহিনী অসঙ্গত মনে হলেও এই জীবন থেকে মুক্তির একটি ছবি ভেসে আসে। নকুড় দসের বিকলাঙ্গ জীবন থেকে বীনু বেরিয়ে আসতে চায় -

"তাহার যেন মনে পড়ে নকুড় দাসের এই সংসারের বাহিরে কত বড় পৃথিবী তাহার জন্য অপেক্ষা করে আছে" - ১২

এই বদ্ধ জীবন থেকে বেরিয়ে আসার যন্ত্রণার ছবিটি তাঁর এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। তিনি চরিত্রের জৈবিক চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেছেন। চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল কল্লোল যুগের নূতনত্ব। প্রেমেন্দ্র মিত্র একটা চিঠিতে অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তকে জানিয়েছেন-

"কিন্তু আসল কথা কি জানিস অচিন, ভালো লাগে না - সত্যি ভালো লাগে না - বন্ধুর প্রেমে আনন্দ নেই, নারীর মুখেও আনন্দ নেই; নিখিল বিশ্বে প্রাণের সমারোহ চলেছে তাতেও পাই না কোনো আনন্দ।" - ১৩

শৈলাজনন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০ খ্রীঃ) কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে প্রথম কথাসাহিত্যে একটা নূতন চাঞ্চল্য এনেছিলেন। তিনি সচেতনভাবে প্রচলিত ধারা থেকে এই নূতনত্ব আনতে উন্মুখ ছিলেন। তাঁর "কয়লা কুঠী" গল্পে (১৩২৯ বঙ্গাব্দ) নূতন জীবনের প্রকাশ ঘটেছিল। তিনি কয়লা খনির সাঁওতাল কুলি মজুরের জীবন কাহিনীতে নূতনত্ব এনেছিলেন। তাঁর কথাসাহিত্যে রাঢ়ের জীবন যাত্রা, সমাজ ও জীবনের বিচিত্র ছবি ফুটে উঠেছে। তিনি বাংলা কথাসাহিত্যে এই নূতনত্ব সেই যুগের "কল্লোল" চেতনাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছিল। এই সময়ে "কল্লোল" এর যে নূতন ধারা এসেছিল সেই ধারায় নেমেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮ খ্রীঃ)। তাঁর উপন্যাসে চরিত্রগুলির মধ্যে যৌনতা স্বীকৃতি পেল। তিনি প্রবলভাবে "কল্লোল" গোষ্ঠীর লেখকদের সঙ্গে জড়িত না থাকলেও কল্লোলের মানসিকতাকে তাঁর উপন্যাসে ফুটে উঠতে দেখি। জীবনের জটিল বাস্তবতা তাঁর উপন্যাসে স্থান পেল। বিশুদ্ধ প্রেমের আদর্শ ও তাৎপর্য বাস্তবতার নিরিখে উঠে এসেছিল। মানব চরিত্রের চেতন ও অবচেতন মনের দ্বন্দ্ব ও নর-নারীর জীবনের জটিল কৌতূহল উপন্যাসে ফুটে উঠেছিল। তাঁর "দিবারাত্রির কাব্য" উপন্যাসে (১৯৩৫

খ্রীঃ) নূতনত্ব না থাকলেও চরিত্রগুলি বাস্তবে রক্ত মাংসের নর-নারী হয়ে উঠেছিল। তিনি দাম্পত্য জীবনের সামঞ্জস্যহীনতা "পুতুলনাচের ইতিকথা" (১৯৩৬ খ্রীঃ) উপন্যাসে দেখিয়েছেন। এই উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র কুসুম। তার বিবাহ হয়েছে সেই গ্রামেই। তবু তার মধ্যে দাম্পত্য জীবন থেকে বেরিয়ে আসার তীব্র মানসিকতা লক্ষ করা যায়। শশীর প্রতি ভালোবাসার আকর্ষণ তাদের দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরিয়েছিল। কুসুমের মধ্যে যৌন আকর্ষণের আভাস ফুটে উঠেছে। কুসুমের উক্তিতে তার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায় -

"আপনার কাছে দাঁড়ালে, আমার শরীর-এমন করে কেন ছোট বাবু ? " - ১৪

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শশীর মধ্যে দিয়ে গ্রাম্য বধূর জীবন ও চরিত্রের বাস্তব সত্যকে বহন করে এনেছেন। নর-নারীর জীবনে এই প্রেম পিপাসাকে অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র যেভাবে এনেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাস্তবতার পথে তাকে আরো গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিলেন, যা কল্লোলীয় ধারার উপকরণ বলা যেতে পারে। তাঁর "চতুষ্কোণ" উপন্যাসে বিকৃত ও অস্বাভাবিক যৌনতার চেতন-অবচেতন মনের দিকগুলি অভিনব রূপদান করেছিল। মানব মনের এই জটিল মনলোকের বিশ্লেষণ তাঁর উপন্যাস জগতে অভিনবত্বের স্বাদ এনেছিল। এই ধারায় বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসগুলি কল্লোলীয় চেতনায় কতটা নূতনত্ব এনেছিল তা বিশ্লেষণ করাই আমার গবেষণার মূল লক্ষ্য।

উল্লেখপঞ্জী

১) অভিশাপ/নজরুল ইসলাম/কল্লোল/১৩৩০ বঙ্গাব্দ শ্রাবণ, চতুর্থ সংখ্যা/পৃষ্ঠা-১০

২) বুদ্ধদেব বসু রচনা সংগ্রহ, (ষষ্ঠ খণ্ড)/রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক (সাহিত্যচর্চা), প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬ সাল, গ্রন্থালয় প্রাঃলিঃ/ পৃষ্ঠা-৩১০

৩) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পঞ্চম খণ্ড, / ডঃ সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশিং প্রাঃ লিঃ ২৫ শে মার্চ, ১৯৯৯/ পৃষ্ঠা-৩৩৩

৪) বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা/সত্যেন্দ্রনাথ রায়/প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০০০/ প্রকাশক - সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কোলকাতা - ৭৩/ পৃষ্ঠা- ২৩

৫) কল্লোল যুগ/অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত/প্রকাশক- শমিত সরকার, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ নবম প্রকাশ - মাঘ ১৪০৯/পৃষ্ঠা - ৬১

৬) আত্মস্মৃতি, সজনীকান্ত দাস, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১১২

৭) ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের "কালিকলমে" প্রকাশিত পত্র থেকে/ পৃষ্ঠা-১০

৮) কল্লোল যুগ/ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত/ শমিত সরকার, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ নবম প্রকাশ - মাঘ ১৪০৯/ পৃষ্ঠা- ৮২

৯) জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)/প্রথম প্রকাশ ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ/প্রকাশক- আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ পৃষ্ঠা-৬৯

১০) আরণ্যক/বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়/ জৈষ্ঠ, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, প্রকাশক- তারাদাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ স্ট্রীট, কোলকাতা-১২/ পৃষ্ঠা- ১৭০

১১) হাঁসুলী বাঁকের উপকথা/তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়/বেঙ্গল পাবলিসার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বি.বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩, প্রকাশক- ময়ূখ বসু, নূতন সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০৭/ পৃষ্ঠা- ১৪০

১২) উপনয়ণ/প্রেমেন্দ্র মিত্র/প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারী ১৯৮৩, প্রকাশক- ফণীভূষণ দেব, আনন্দ পাব্লিসার্স প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা-৯/ পৃষ্ঠা- ৭০।

১৩) কল্লোল যুগ/অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত/ শমিত সরকার, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ নবম প্রকাশ - মাঘ ১৪০৯/ পৃষ্ঠা- ১২

১৪) পুতুলনাচের ইতিকথা/মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়/প্রকাশক- শ্রী সোমশুভ মুখোপাধ্যায়, পঞ্চদশ মুদ্রণ, ফাল্গুন, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, প্রকাশ ভবন, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩/ পৃষ্ঠা-১১৯।